Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

দানকেলিকৌমুদী : বিষয় ও প্রকরণ

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mayna Talukdar
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.6
Pages	৬৯-৮৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

দানকেলিকৌমুদী : বিষয় ও প্রকরণ

ড. ময়না তালুকদার*

সার-সংক্ষেপ : মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেমধর্ম মৃতপ্রায় বাঙালিচিত্তে সঞ্চার করেছিল প্রাণশক্তি। তিনি প্রচার করেছিলেন যে, জগতের সকল মানুষই সমান। তাঁর এই অসামান্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে মানুষ কৃষ্ণপ্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হতে শুরু করে। তিনি তাঁর প্রেমাপ্লুত জীবনের দিব্য ভাবধারায় যাঁদের আপন করেছিলেন, যাঁরা প্রেমধর্মকে শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রূপ গোস্বামী (১৪৯০–১৫৫৯) অন্যতম। কাব্য, নাটক ও নাট্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে তিনি মধ্যযুগে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকা শ্রেণির উপরূপক। এই উপরূপকটি একটি অঙ্কে সমাপ্ত ও হাল্কা রসের নাটক। গোবর্ধন গিরিপ্রান্তে মানসগঙ্গার তটে ঘাটোয়াল সেজে শ্রীকৃষ্ণ রাধার পথরোধ করে শুল্ক আদায় করতে গিয়ে প্রণয়ের যে অভিনব ধারা নাটকটিতে সৃষ্টি করেছেন, তা সত্যিই অসাধারণ। নাট্যকার অভিনব ঘটনা, মধুরভক্তিরস ও নানা চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে নাটকটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে ভাণিকাটির বিষয়বস্তু, চরিত্র-চিত্রণ, রাধা-কৃষ্ণের দুরূহ বিলাসলীলা, রস ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাসে অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম। তাঁর আবির্ভাবের প্রায় দুশো বছর পূর্বে তুর্কিরা বাংলাদেশ জয় করে, ভারতবর্ষে ইসলামের অভিযাত্রা সূচিত হয়—ব্রাহ্মণ্য-নির্যাতন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় নিম্নবর্গের মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই ক্রান্তিলগ্নে মধ্যযুগে সমাজসংস্কারক রূপে আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্যদেব। সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে তিনি পালন করেছেন একজন বিপ্লবী চিন্তকের ভূমিকা। নিরন্তর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও নির্দেশ-উপদেশের মাধ্যমে তিনি তাঁর সাধনালব্ধ ধর্মতত্ত্ব শিক্ষিত মননশীল অনুগামীদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। তাঁর ধর্মবিশ্বাস যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বলে পরিচিত, তার ব্যাপক প্রচারের জন্য তিনি কোনো গ্রন্থ রচনা বা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেননি। তার পরিবর্তে তিনি কয়েকজন প্রতিভাবান ভক্ত অনুগামীকে বেছে নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় ভক্তিতত্ত্ব গড়ে তোলার দায়িত্ব তাঁদের দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে তিনি গৌড়দেশে প্রেমধর্ম প্রচারের দায়িত্ব অর্জন করেন। আর রূপ-সনাতন-জীব-গোপালভট্ট-রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্টকে গৌড়ীয় ভক্তিশাস্ত্র রচনা ও লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের জন্য মথুরা-বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। এই ছয়জনই বৃন্দাবনে 'ছয় গোস্বামি'

*সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বলে বৈষ্ণব সাহিত্যে গ্রথিত। এই ছয়জনের মধ্যে সনাতনের অকুণ্ঠ শাস্ত্রনিষ্ঠা, রূপের প্রগাঢ় রসমাধুর্যনিষ্ঠা, জীবের গভীর তত্ত্বনিষ্ঠা, গোপাল ভট্টের সুতীব্র আচারনিষ্ঠা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে দৃঢ়মূল করেছে। এঁদেরই একান্ত চেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্ব ভক্তিবাদের ভিত্তিপত্তন হয়েছে। (নরেশচন্দ্র জানা, ১৯৭০ : ১৮) তাঁরা তাঁদের ভক্তিধর্মে মধুর রসের প্রাধান্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকেই আরাধ্য দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর মহাভাবস্বরূপিণী রাধা হলেন সেই রসসাধনার কেন্দ্রবিন্দু এবং গোপিনীরা হলেন রাধার কায়ব্যূৎস্বরূপ। তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অকল্পনীয় লীলার নাম দেওয়া হলো 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক যেমন ভেদ, তেমনি অভেদ। তবে এটি সাধারণের বোধগম্য নয় বলে একে অচিন্ত্য বলা হয়েছে। তাঁরা ধর্মসংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত চৈতন্যাবতারের নতুন তত্ত্ব স্থাপন করলেন।

সেন আমলের পর থেকে বাঙালির সংস্কৃতচর্চা শুধুমাত্র নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক-কবিদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ধর্মীয় ভাবের কাব্য, নাটক, চম্পূ, নিবন্ধ, অলংকার ও রসশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। চৈতন্যদেব নিজেও সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু ধর্মকে তো শুধু আলাদা আলোচনা, মত বিনিময় আর মৌখিক প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, যে কোনো মতাদর্শকে একটা স্থায়ী দেশ-কাল-নিরপেক্ষ রূপ দিতে গেলে তো তার একটা তাত্ত্বিক দার্শনিক ভিত্তি থাকা চাই। তা নির্মাণের জন্য তিনি রূপ গোস্বামীকে মনোনীত করে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব বিষয়ে ভাগবত সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যা করে শোনালেন। প্রভুর নির্দেশিত ভক্তিসূত্র অনুসরণ করেই রূপ গোস্বামী বৈষ্ণবশাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রূপ গোস্বামী বেদান্ত দর্শনের অভিব্যক্তির ক্রমধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একজন নিষ্ণাত ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্ম সম্ভবত ১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের (বর্তমান) বরিশাল জেলার ফতেহাবাদ গ্রামে। তখন এটি ছিল চন্দ্রদ্বীপ পরগণার অন্তর্গত। তাঁরা অবশ্য পুরুষাক্রমে এদেশের অধিবাসী ছিলেন না। তাঁর প্রপিতামহ রূপেশ্বর ছিলেন গৌড়ের প্রধানমন্ত্রী। ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দে রূপেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পদ্মনাভ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। পদ্মনাভ গৌড়ের মন্ত্রিত্ব থেকে অবসর নিয়ে নবহট্ট বর্তমানে নৈহাটিতে বসবাস করতেন। পদ্মনাভের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন মুকুন্দদেব। মুকুন্দদেবের পুত্র কুমারদেব নৈহাটিতে বসবাস করতে পারেননি। পারিবারিক বিবাদের কারণে তিনি নৈহাটি ছেড়ে বঙ্গদেশের বরিশাল জেলায় চলে যান। কুমারদেব ছিলেন রূপের পিতা এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল রেবতী দেবী। রেবতী দেবীর গর্ভে কুমারদেবের তিন পুত্রের জন্ম হয়। এই তিন পুত্রের নাম হলো—সনাতন, রূপ ও অনুপম বা বল্লভ। রূপের বাল্যনাম ছিল সন্তোষ। 'রূপ' নামটি চৈতন্যমহাপ্রভু প্রদত্ত। রূপ গোস্বামী ছিলেন গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের প্রধান অমাত্য। 'দবির খাস'[১] হলো তাঁর সুলতান প্রদত্ত উপাধি। চৈতন্যমহাপ্রভুর ইচ্ছায় তিনি গৌড়েশ্বরের অমাত্যপদ ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থলী বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারে ব্রতী হন এবং সঙ্গে

সঙ্গে বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রন্থসমূহের প্রণয়নের কাজও করতে থাকেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি স্থাপনে ও রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে এই গ্রন্থসমূহের গুরুত্ব অসামান্য। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—

বৃন্দাবনীয়ং রসকেলিবার্ত্তাং কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।

সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ সঃ প্রভুবিধো প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥

অর্থাৎ, ঈশ্বর যেমন বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে বিধাতায় শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যও তেমনি উৎকণ্ঠিত হয়ে বৃন্দাবনে হারিয়ে যাওয়া রসলীলার কথা আবার জাগিয়ে তোলার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামীতে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৭ : ২০৮)

রূপ গোস্বামী ছিলেন একাধারে মধ্যযুগের অদ্বিতীয় কবি, সাধক এবং বৈষ্ণবধর্মের আদর্শ গুরু। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে মানবকল্যাণকামী নানা নিরলস কর্মের দ্বারা তাঁর সাধনজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের যোগ্য প্রয়োগ করে অজস্র গ্রন্থপ্রণয়নের মাধ্যমে মহাপ্রভুর মহৎ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হলো—*হংসদূত*, *উদ্ধবসন্দেশ*, *স্তবমালা*, *বিদগ্ধমাধব*, *ললিতমাধব*, *দানকেলিকৌমুদী*, *পদ্যাবলী*, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, *উজ্জ্বলনীলমণি*, *মথুরামাহাত্ম্য*, *নাটকচন্দ্রিকা*, *লঘুভাগবতামৃত*, *গোবিন্দবিরুদাবলী*, *উৎকলিকাবল্লী*, *প্রেমসিন্ধুসাগর* প্রভৃতি। এছাড়া আরো অনেক গ্রন্থের নাম রূপ গোস্বামীর নামে প্রচারিত হলেও সেগুলো আসলে রূপ গোস্বামীর কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতমহলে সংশয় রয়েছে। ভাববিভোর কুলতিলক অথচ অতলান্ত সমুদ্রের ন্যায় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন রূপ গোস্বামীর প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা এই অসাধারণ গ্রন্থগুলি ভারতীয় সাহিত্যকে এক অত্যুচ্চ সীমায় স্থাপন করেছে। আনুমানিক ১৫৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

রূপ গোস্বামীর বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে *দানকেলিকৌমুদী* একটি অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। তিনি ১৫৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এটি রচনা করেন। এই রূপকটি একটি অঙ্কে সমাপ্ত ভাণিকা শ্রেণির [২] উপরূপক। এটি হাল্কা রসের নাটক। এই নাটকের ভাষা মিশ্র। এই নাটকে রূপগোস্বামী পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচনা করেছেন। এই নাটকের কাহিনি নির্বাচনে নাট্যকারের মৌলিকতার পরিচয় বিদ্যমান। কিংবদন্তি আছে যে, রাধাকুণ্ডতট নিবাসী রঘুনাথ দাস রূপগোস্বামীর *ললিতমাধব* নাটক পড়ে রাধার বিরহ-বেদনায় বিহ্বল হয়ে একেবারে উন্মত্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন, এমন কি তাঁর প্রাণরক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল। তখন রূপগোস্বামী রঘুনাথ দাসের অন্তর্দাহ প্রশমনের জন্য হাস্যপরিহাসযুক্ত সম্ভোগরস এই *দানকেলিকৌমুদী* রচনা করে তাঁকে অর্পণ করেন এবং *ললিতমাধব* নাটকটি ফিরিয়ে আনেন। রঘুনাথও রসান্তরে

মনোনিবেশ করে সুস্থ হন। এটা কতদূর সত্য তা জানা না গেলেও গ্রন্থশেষে রূপ গোস্বামী যা লেখেন তা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কোনও প্রিয় সুহৃদের অভিপ্রায় অনুসারে তিনি এই ভাণিকাখানি রচনা করেন। ভাণিকাটির বিষয়বস্তু হলো— বসুদেব তাঁর নিজপুত্র বলরাম এবং মিত্রপুত্র শ্রীকৃষ্ণের শান্তি কামনা করে গর্গের জামাতা ভাসুরিকে দিয়ে গোবিন্দকুণ্ডের তীরে এক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। গুরুজনদের আদেশে রাধা তাঁর পঞ্চসখি ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, বৃন্দা ও চম্পকলতাকে নিয়ে এ যজ্ঞস্থলে হৈয়ঙ্গবীন (সদ্য প্রস্তুতকৃত) ঘৃত বিক্রয়ের জন্য যান। পৌর্ণমাসী খবরটা আগেই জানতে পেরে নান্দীমুখীকে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণও মধুমঙ্গল, সুবল, অর্জুন প্রভৃতি সখাবৃন্দকে নিয়ে সেই গোবর্ধন পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন এবং ঘাটোয়াল সেজে রাধা ও তাঁর সখীদের পথ অবরোধ করে তাঁদের কাছে শুল্ক দাবি করেন। রাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখেই তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে রাধা তাঁর সামনে অনুরাগজনিত ভাব গোপন করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কোন শুল্ক দিতেও অপারগতা প্রকাশ করলেন। এ অবস্থা দেখে সুবল তাঁদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম না করলে কোনো অবস্থাতেই এই ঘাট পার হতে দেওয়া যাবে না। সুবলের মুখে একথা শুনে বিশাখা হেসে বললেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাউকে প্রণাম করতে ভগবতী পৌর্ণমাসী নিষেধ করেছেন। তাই তাদের পক্ষে কাউকে প্রণাম করা সম্ভব নয়। এভাবে একের পর এক তর্ক-বিতর্কে তারা সকলে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে ললিতাকে বললেন যে, হৈয়ঙ্গবীনের কলস নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁকে অবশ্যই শুল্ক প্রদান করতে হবে। একথা শুনে রাধার সখীগণ অত্যন্ত বিনয় স্বরে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন তাদের পথ ছেড়ে দেন। ললিতাকে শান্ত করার জন্য সুবল শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তাকে তাম্বুলবীটিকা দ্বারা আতিথেয়তা করার চেষ্টা করেন। তাতেও যখন বিবাদ মীমাংসা হচ্ছিল না তখন শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ভয় দেখিয়ে বললেন, যদি তাঁর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে রাধা গমন করেন, তাহলে তিনি তাঁর এই চপল হস্ত দ্বারা তাঁকে আকর্ষণ করবেন। একথা শুনে রাধা নীরব থাকলেন ঠিকই কিন্তু ললিতা শ্রীকৃষ্ণের এই কাপট্যপূর্ণ মন্তব্যের জবাবে নানা কটূক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন। এভাবে অনেকক্ষণ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের এক পর্যায়ে ললিতা চিত্রার অঙ্গুলি হতে মণিময় অঙ্গুরী শুল্কস্বরূপ তাঁদের প্রদান করলেন। কিন্তু তাতেও যখন শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হলেন না তখন ললিতা রাধার কণ্ঠস্থ হার শুল্কার্থস্বরূপ অর্পণ করে বললেন—ঘট্টনাথ! এষা অনর্ঘা মৌক্তিকাবলী ময়া উপনিধীকৃতা। পুমানুপনিধির্ন্যাস ইত্যমরঃ। অতঃ প্রদোষে সুবর্ণোপনয়েন পুনস্ত্বত্তো মোচয়িতব্যা সুবর্ণানাং পক্ষে সুবর্ণায়াঃ রাধায়া উপনয়েন অর্থাৎ হে ঘট্টনাথ! এই অমূল্য মৌক্তিকমালা তোমার নিকট গচ্ছিত রাখলাম, পুনরায় সন্ধ্যার সময় তোমাকে সুবর্ণ অর্থাৎ রাধাকে অর্পণ করে এই মালা গ্রহণ করব। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ১১৮) তারপরেও যখন

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল তখন ললিতা ও বিশাখা শুল্কস্বরূপ বৃন্দা ও চম্পকলতাকে গ্রহণ করতে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাতেও সম্মত হয়ে তাঁদেরকে মুক্তি দিলেন না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র রাধাকেই তাঁর উপযুক্ত বলে মনে করেন। এরূপ বাক-বিতণ্ডার মধ্যে দুপুর ঘনিয়ে এলো। পৌর্ণমাসী মধ্যস্থতা করার জন্যে এগিয়ে এসে বললেন, প্রিয়ার উপহার ব্যতিরেকে এ ধীর অক্রোধ হবেন না। অতএব, এই পদ্মনয়নী পরম আরাধনীয়া রাধাই তাঁর উপযুক্ত। অন্য কেউ নন। একমাত্র রাধাই শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করার মহৎ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। পৌর্ণমাসীর মুখে একথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ আহলাদিত হয়ে উঠলেন। পৌর্ণমাসীর সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা নির্জন কেলিকুঞ্জে কিছুক্ষণ বিলাস করলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ সখীগণসহ রাধাকে যজ্ঞস্থলে গমন করার অনুমতি দিলেন। এভাবে নাটকটির সমাপ্তি ঘটল। একটি মাত্র অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকে নাট্যিক উৎকর্ষ লক্ষ্য করা না গেলেও হাস্যপরিহাসরঙ্গতায়, বর্ণনার বিচিত্ররসতায়, কল্পনার বৈচিত্র্যে ও রচনার মাধুর্যে এই নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তবে এখানে নাট্যকার দুটি অভিনব বিষয়ের অবতারণা করেছেন—এক, বৃন্দাবনে রাধার রাজ্য-অভিষেক, দুই, রাধাকৃষ্ণের পাশাখেলা।

সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বে দশপ্রকার রূপক[৪] এবং আঠারো প্রকার উপরূপক[৫] পরিলক্ষিত হয়। এই দশ প্রকার রূপক ও আঠারো প্রকার উপরূপকের মধ্যে ভাণ, ব্যায়োগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন—এই পাঁচ প্রকার হলো একাঙ্ক রূপক। গোষ্ঠী, নাট্যরাসক, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, শ্রীগদিত, বিলাসিকা, হল্লীশ ও ভাণিকা—এই দশ প্রকার হলো একাঙ্ক উপরূপক। চরিত্র বিচারের বৈচিত্র্যও এখানে কম নেই। অতএব, সংস্কৃত একাঙ্ক নাট্যচর্চার ঐতিহ্য সহজেই অনুমান করা যায়। সেই হিসেবে বিদগ্ধ পণ্ডিত রূপ গোস্বামীর *দানকেলিকৌমুদী* সত্যিই অসাধারণ একটি রচনা। রচনাটিতে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে রূপগোস্বামী অলংকার প্রয়োগের কলাকৌশলে এবং রসগভীর ব্যঞ্জনায় তাঁর মনের রং তুলি দিয়ে আঁচড় কাটেননি।

দানকেলিকৌমুদী ভাণিকার বিষয়বস্তু অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এখন এই ভাণিকার বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রসমূহের সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পাব। এই ভাণিকার নায়ক চরিত্র হলেন শ্রীকৃষ্ণ আর নায়িকা হলেন রাধা। এছাড়া রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়লীলার সহযোগী হিসেবে এসেছে ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, পৌর্ণমাসী, বৃন্দাদেবী, নান্দীমুখী প্রভৃতি নারী চরিত্র। আবার অন্যপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সহায়ক হিসেবে এসেছে সুবল, মধুমঙ্গল, অর্জুন প্রমুখ। এছাড়া নাট্যকার নাটককে আনন্দমুখর ও উপভোগ্য করে তোলার জন্যে আরো অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় অপ্রধান চরিত্রগুলোকে বিশ্লেষণে আনা হয়নি। নিম্নে ভাণিকাটির প্রধান কয়েকটি চরিত্র তুলে ধরা হলো :

শ্রীকৃষ্ণ

দানকেলিকৌমুদী ভাণিকার নায়ক হলো শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বহুবিধ গুণ ও ক্রিয়ার আধার। বিভিন্ন লীলা অনুসারে তিনি বিভিন্নভাব প্রকাশ করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করে তাকে ধীরললিত শ্রেণির[৬] নায়ক বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে প্রধান লীলা হলো দানলীলা। এক্ষেত্রে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের দানলীলা প্রসঙ্গটি সম্ভবত রূপগোস্বামীর *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকার আংশিক প্রেরণাস্থল হতে পারে। তবে প্রেরণাস্থল হলেও এই ভাণিকার বিষয়বস্তু রচনায় নাট্যকার মৌলিকতা প্রদর্শন করেছেন। বসুদেব দ্বারা আয়োজিত যজ্ঞে প্রয়োজনীয় ঘৃত সরবরাহ করার জন্যে রাধা যজ্ঞস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ঘাটোয়াল সেজে রাধা ও তাঁর সখীদের কাছে দান-শুল্ক প্রার্থনা করেন। এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ দানঘাটের রক্ষক হলেও রাধার সক্রিয়তাই লক্ষণীয়। এখানে রূপগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আরো উল্লেখ্য যে, বৃন্দাবনলীলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনি বৃন্দাবনেশ্বরী রূপে রাধার রাজ্যাভিষেক সম্পাদন করেছেন। ফলে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার চরিত্রের সক্রিয়তা বেশি লক্ষিত।

দানকেলিকৌমুদী ভাণিকায় শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের রাজকুমার ছিলেন। গোবর্ধন পর্বতে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে রাধাকে দেখেন এবং দেখেই হৃদয়ে অনুরাগ অনুভব করেন। তাই তিনি তাঁর অনুরাগজনিত অন্তরের কথা ব্যক্ত করেন :

> যিনি মুক্তাহারের শোভা দ্বারা স্বীয় অনুরাগ বর্দ্ধিত করিয়া কর্ণপ্রদেশের ভূষণ বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি চতুঃষষ্টি কলায় অঙ্কিতা অদ্য আমি সেই স্বীয় শ্রীরাধাকে পরিবাদকারিণীর ন্যায় প্রাপ্ত হইলাম। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ২৪)

এরপর শ্রীকৃষ্ণ নিজে বংশীবাদন শুরু করে সখাবর্গকে নির্দেশ দিলেন শৃঙ্গবাদ্য করে গোপিকাবৃন্দের কাছ থেকে ঘৃতের ঘট অধিকার করতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই রাধানুরাগ রাধা অবজ্ঞা করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কোন শুল্ক দিতেও অপারগতা প্রকাশ করলেন। এ অবস্থা দেখে সুবল বারবার বলতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণকে উপযুক্ত মর্যাদা না দিয়ে কোন অবস্থাতেই কাউকে ঘাট পার হতে দেওয়া হবে না : 'প্রথমং তাবৎ ক্ষৌণীবিলগ্নমস্তকাঃ সত্যঃ বন্দন্তাং মহাঘট্টদানীন্দ্রং ভবত্যঃ অর্থাৎ তোমরা অগ্রে ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া মহাঘট্টদানীন্দ্রকে প্রণাম কর'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ২৮) এর উত্তরে বিশাখা বললেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাউকে প্রণাম করা নিষেধ। এরপর উপর্যুপরি তারা তর্কবিতর্ক ও বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে মধুমঙ্গল বললেন, অনেকক্ষণ ধরে হৈয়ঙ্গবীনের ঘট বহন করে রাধা ও তার সখিরা পরিশ্রান্ত। তাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শুল্ক প্রদান করে গোপিকাগণ চলে যেতে পারবেন। একথা শুনে

ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, আপনি বৃন্দাবনের যুবরাজ, এ ধরনের কপটতাপূর্ণ আচরণ আপনার পক্ষে অশোভন। তখন প্রতিজ্ঞায় অনড় শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'অতিশয় আগ্রহশালি দুরন্ত শাসন অটবী চক্রবর্ত্তি কর্তৃক আমি এই ঘোর ঘাট পাহারায় নিযুক্ত হইয়াছি, কিন্তু কিছু করিবার শক্তি নাই, আমি অপরের অধীন'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ৩২)। এ কথার উত্তরে বিশাখা বললেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কংসের অধীন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, তিনি মহামন্মথের অধীন। এই মহামন্মথের পরিচয় দান প্রসঙ্গে মধুমঙ্গল প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে বললেন যে, হৈয়ঙ্গবীনের কলস নিয়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই তাঁকে শুল্ক প্রদান করতে হবে। একথা শুনে রাধার সখীগণ নানা অনুনয়-বিনয় করে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন তাঁদের পথ ছেড়ে দিতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নাছোড়বান্দা। কারো অনুরোধই তিনি না শুনে বরং রাধাকে চর্বিত তাম্বূল প্রদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এতে ললিতা তীব্রভাবে বাধা প্রদান করলেন। এরপরেও শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে মহাবৈভবরূপ আলিঙ্গনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই আচরণে রাধা ক্রোধান্বিতা হলেন। এরপর অপ্রতিরোধ্য শ্রীকৃষ্ণ নিজের কামকলার উদ্দেশ্য স্বমুখে ব্যক্ত করলেন এভাবে :

> এই পর্ব্বতে আমি হারাদিবিত্ত হরণ করিয়া কত কত না হরিণনয়না রমণীদিগকে জৈনদীক্ষা অর্থাৎ বিবসনত্ব ব্রত গ্রহণ করাইয়াছিলাম, তাহারা বিনয় বাক্যসহকারে নতবদনে দীনতা প্রাপ্ত হইলে দূরবর্ত্তি লতারূপা সখী সকল পত্রদান দ্বারা তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিল। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ৪৪)

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বললেন যে, রাধা যেন স্পষ্টভাবে তাঁকে জানান, হয় তিনি শুল্ক প্রদান করবেন নতুবা পর্বত গুহায় আতিথ্য গ্রহণ করবেন। একথা শুনে রাধা নীরব থাকলেন; কোনো কথা বললেন না। এতে শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন, নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ। এরপর নান্দীমুখীর কথামতো শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে আদেশ দিলেন যে, হৈয়ঙ্গবীনের শুল্ক যেন গোপিনীবর্গের কাছ থেকে কম পরিমাণে নেওয়া হয় :

> গোকুল মধ্যে অতিশয়রূপে প্রসিদ্ধ সূর্য্যোপাসিকা কিশোরীদিগের হৈয়ঙ্গবীন অত্যন্ত মধুর, একারণ প্রতি টঙ্কের সমুচিত শুল্ক তিন স্বর্ণটঙ্ক হয়, তাহা গ্রহণ না করিয়া এক টঙ্কের কনিষ্ঠ টঙ্ক গণনায় অর্থাৎ চারি গুঞ্জা পরিমাণের টঙ্ক গণনায় শুল্ক বিত্ত গণনা কর, যেহেতু ইহাদের প্রতি ভগবতী নান্দীমুখীর পক্ষপাতিতা আছে। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ৪৭)

কিন্তু মধুমঙ্গলের প্ররোচনায় শ্রীকৃষ্ণ দানের শুল্কের পরিমাণ 'চতুরশীতিলক্ষ টঙ্ক' রূপে বৃদ্ধি করলেন কারণ হৈয়ঙ্গবীন ঘটের ভার দুর্বহ। তাছাড়া রাধার সখিবৃন্দ একেকজন টঙ্ক ও সুবর্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। ফলে এই সখিবৃন্দের মধ্যে একজনকে শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ

করলেই প্রকারান্তরে শুল্ক প্রদানই করা হবে এই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে কামনা করলেন। এখানে দানী কৃষ্ণের আচরণ চতুরতায় পূর্ণ। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ দানঘাটের রক্ষকরূপে উপযুক্ত শুল্কের পরিমাণ ধার্য করেছেন, অন্যদিকে কামকলার বিদগ্ধ নায়করূপে শুল্ক প্রদানের ছলে রাধাসহ গোপিনীবর্গের সঙ্গে কামকেলিতে লিপ্ত হতে চেয়েছেন। এখানে দুরকম ভূমিকাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এরপর শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে স্পর্শ করতে চাইলে রাধা বাধা দিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'লক্ষৈশ্চতুরশীত্যা হি শুল্কৈর্বিনিময়ং গতং। ন যৌবতশিখারত্নং কুতস্ত্বাং ধারয়াম্যহং। ইতি দিধীর্ষুঃ প্রসর্পতি অর্থাৎ তুমি যুবতীগণের শিরোমণি, চতুরশীতিলক্ষ শুল্ক দ্বারা বিনিময় করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি এতএব ধরিব না কেন? এই বলিয়া ধারণেচ্ছায় পাদনিক্ষেপ করিলেন'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ৬০) তখন শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে যেন স্পর্শ করতে না পারে সেজন্য ললিতা বাধাপ্রদান করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অনড়, অবিচল। তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে গোপিনীবৃন্দের স্তন কামনা করার কথা বললেন। তিনি আরো বললেন, গোপিনীবৃন্দ স্বর্ণকলস গোপন করার দোষে তাদেরকে শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকের স্তনের নিমিত্ত শুল্কের পরিমাণ ধার্য করলেন। এখানে রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে রেহাই নেই ভেবে বিশাখা নিরূপায় হয়ে শুল্কস্বরূপ বৃন্দাকে, চম্পকলতাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করতে চাইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র রাধাকেই তার উপযুক্ত বলে মনে করেন। রাধা ছাড়া অন্য কোনো সখির কথা তিনি চিন্তাই করতে পারেন না। তাই শুল্ক প্রদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বার বার গোপিনীবৃন্দকে জোর করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে দুপুর ঘনিয়ে এলো। শ্রীকৃষ্ণের এই জবরদস্তি আচরণে ললিতা রাধার কণ্ঠস্থ হার শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করলেন। কিন্তু এতেও শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হলেন না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ নান্দীমুখীকে অনুরোধ করলেন রাধাকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে অন্য সখিরা চলে যেতে পারবেন। কিন্তু পৌর্ণমাসী এসে বললেন, রাধা মহামূল্যবান, তাকে লাভ করা সহজ নয়। শেষপর্যন্ত পৌর্ণমাসীর মধ্যস্থতায় রাধা শ্রীকৃষ্ণের সাথে কামবিলাসে সম্মত হলেন। সায়ংকালে শুল্কস্বরূপ রাধা শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হবেন এই প্রতিজ্ঞা করে তিনি সখিদের নিয়ে যজ্ঞস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

সমগ্র নাটকটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় দানীরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভূমিকা যথাযোগ্যভাবে পালন করেছেন। প্রতিটি মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ শুল্কের জন্যে রাধাসহ সখীবৃন্দের কাছে যেভাবে দর কষাকষি করেছেন, তা সত্যিই অভিনব। দানঘাটের রক্ষকরূপে ও গোকুলের রাজকুমার রূপে দান সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় ও যুবরাজ সূত্রে কর প্রদান সম্পর্কিত নিয়মে শ্রীকৃষ্ণ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। প্রজাবর্গকে যে রাজ্যের

রাজাকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট নিয়মে শুল্ক তথা কর প্রদান করতে হয় — এই বিষয়টি নাট্যকার শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। সর্বোপরি নাট্যকার পার্থিব জীবন বিষয়ক অর্থাৎ সমাজের শুল্ক ও কর বিষয়ক ঘটনার আধারে ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার দিব্য বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য বর্ণনা করেছেন। এদিক দিয়ে বলা যায়, সংস্কৃত ভাণিকা *দানকেলিকৌমুদীর* নায়করূপে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে যাবতীয় লক্ষণ নাট্যকার রক্ষা করেছেন।

রাধা

দানকেলিকৌমুদী ভাণিকার নায়িকা গোপবধূ রাধা। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুসারে তিনি পরকীয়া নায়িকা। হৈয়ঙ্গবীনের কলস মস্তকে নিয়ে রাধা বসুদেব আয়োজিত যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে গোবর্ধন পর্বতের সমীপে শ্রীকৃষ্ণ রাধার পথ রোধ করে শুল্ক দাবি করেন। পথরোধ করার আগে সখিবৃন্দের সঙ্গে রাধার কথোপকথনের মাধ্যমে জানা যায়, রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিনী। কিন্তু রাধা শ্রীকৃষ্ণের সামনে অনুরাগজনিত ভাব গোপন করে বারবার তাঁকে অবজ্ঞা করেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন মহাবৈভব দানস্বরূপ রাধার আলিঙ্গন কামনা করেছেন, তখন রাধা শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্যে ক্রোধান্বিতা হয়ে ললিতাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নাছোড়বান্দা; যে কোন উপায়ে রাধাকে লাভ করতে চান তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধাকে স্পর্শ করতে উদ্যত হন তখন তিনি কিছুটা ভীতা হয়ে সখীবৃন্দের দ্বারস্থ হন। কিন্তু পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্যপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে রাধা রুখে দাঁড়ান এবং বলেন, 'কিং বয়ং বাণিজ্যজীবিকাঃ যদঘট্টপালাৎ ত্বত্তো ভয়েনপলায়িষ্যামহে। বাণিজ্যমেব আজীবিকা বার্তা যাসাং তাঃ অর্থাৎ আমরা কি বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি, একারণ তুমি যে ঘট্টপাল, তোমার ভয়ে পলায়ন করিব'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ৫৩) এখানে রাধাকে নাট্যকার প্রতিবাদী চরিত্রে উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে যে শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন, তাতেও রাধা বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি বরং শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করে বলেছেন, শুল্করূপ ধনসম্পদ সঞ্চিত রাখার জন্য তিনি যেন ব্রজ থেকে শকট ও শকটবাহক গো, মহিষ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রাদি আনয়ন করেন। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণের চরম লাম্পট্য দেখে রাধা আরো বলেছেন যে, এই অভিযোগ রাধা কার কাছে জানাবেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজপুত্র হয়ে যদি চরিত্রহীন হন, তাহলে সেই রাজ্যের রমণীদের কে রক্ষা করবেন? রাধা যেহেতু বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষিক্ত তাই তিনি আদেশ দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সখাবৃন্দ যেন বৃন্দাবনের বৃক্ষাদি বিনষ্ট করার জন্য কর প্রদান করেন। নতুবা করের বদলে শ্রীকৃষ্ণসহ গোপবর্গকে ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে। এ কথার প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপিনীকে ক্রীতদাসীরূপে অবরুদ্ধ করতে চাইলেন। শেষপর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সমাধান দিলেন যে, রাধা যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন,

তবে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হবেন। কিন্তু ললিতা বললেন যে, শ্রীরাধা সেবা করবেন না কারণ তিনি বৃন্দাবনেশ্বরী। এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেবাকার্যে স্বীকৃত হলেন। তখন ললিতা প্রিয়সখী রাধার মঙ্গলার্থে কৃষ্ণ-হস্তে নিজেকে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু পৌর্ণমাসী এসে জানালেন যে, শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত রাধাই, অন্য কেউ নন। তাই রাধাই একমাত্র দানবীর কৃষ্ণকে প্রীত করার মহৎ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। পৌর্ণমাসী হস্ত আবরণ করে আরো বললেন, 'জনান্তিকং। রমণীয়কনিধে রমণীমণিরেব তবোপকণ্ঠস্থলশোভনীবভূব। কিমন্যেন ফল্গুনা শুল্কেন অর্থাৎ রমণীয়নিধির রমণীমণিই তোমার উপকণ্ঠ স্থানের শোভাদায়িনী হইয়াছেন, অন্য তুচ্ছ শুল্কে প্রয়োজন নাই'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ১২৪)

পৌর্ণমাসীর এই উক্তির মাধ্যমে নাট্যকার *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকায় নায়ক কৃষ্ণচরিত্র অপেক্ষা নায়িকা রাধা চরিত্রের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা স্থাপন করেছেন। এই ভাণিকায় নাট্যকার শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার চরিত্রটিকে অনেক বেশি সক্রিয় করে তুলে ধরেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাশাখেলায় রাধার জয়, বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে রাধার রাজ্যাভিষেক, রাধার কানন কর আদায়ের আদেশ, শ্রীকৃষ্ণসহ গোপবর্গকে করের বদলে ক্রীতদাস করে রাখার আদেশ—এই সব অভিনব ও মৌলিক বিষয় নাট্যকার রাধাচরিত্রে যুক্ত করে নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছেন। একদিকে রাধা যেমন গোপবধূরূপে গুরুজনদের আদেশে হৈয়ঙ্গবীন কলস মাথায় নিয়ে ঘৃত বিক্রির জন্যে যজ্ঞস্থলে গমন করেন, অন্যদিকে তিনি বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে নিজের ক্ষমতা, অহংকার ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণসহ গোপবৃন্দের সামনে প্রদর্শন করেছেন। এই বৈপরীত্য রাধাচরিত্রে সমানভাবে ফুটে উঠেছে। *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকায় রূপগোস্বামী মধ্যযুগীয় সমাজের এক প্রতিস্পর্ধী নারীচরিত্রের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্ররূপে রাধাকে অঙ্কন করেছেন।

দানকেলিকৌমুদী ভাণিকায় রূপ গোস্বামী কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। প্রত্যেকটি পার্শ্বচরিত্র স্ব-স্ব ভূমিকায় উজ্জ্বল। সর্বোপরি একাঙ্ক নাটকের স্বল্প পরিসরে চিত্রিত পার্শ্বচরিত্রগুলি সংক্ষিপ্ত সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকারের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলেছে। কাজেই বলা যায়, *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকার পার্শ্বচরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার রূপ গোস্বামী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের বর্ণনা-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

ললিতা

রাধার সখি ললিতা এই ভাণিকার অন্যতম প্রধান চরিত্র। এই ভাণিকার অধিকাংশ জুড়েই ললিতার সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষণীয়। নাটকের শুরু থেকে শেষ অবধি প্রায় সর্বক্ষণই তিনি রাধার পেছনে ছায়ার মতো থেকে তাঁর জীবনকে প্রীতিস্নিগ্ধ আবেশে

ভরিয়ে তুলেছেন। রাধার প্রতি ললিতার ছিল এক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা। তাই রাধা যখন মাথায় ঘৃতের কলস নিয়ে যজ্ঞের উদ্দেশে গমন করেছেন, তখন ললিতা দুর্বহ ভারবহনে রাধার কষ্টের কথা ভেবে কাতর হয়ে তাকে কলস প্রদান করার জন্যে অনুরোধ করেন। ললিতা ছিলেন রাধার সত্যিকারের প্রিয়সখি। তাই তিনি রাধার দুঃখে দুঃখিত হয়েছেন আবার রাধার সুখে সুখী হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন নানারকম প্রহসনমূলক আচরণের দ্বারা অর্থাৎ শুল্ক আদায়ের ছলে রাধার সঙ্গ কামনা করেছেন, তখন ললিতা প্রিয়সখি রাধার পাশে থেকে শ্রীকৃষ্ণকে ভয় না পেয়ে তীব্রভাবে বাধাপ্রদান করে বলেছেন, 'হে গোকুলানন্দ! একগ্রাম নিবাসী আমাদের মতো বিশুদ্ধ প্রকৃতির যশস্বিনী মহিলাদের প্রতি তোমার মত ব্যক্তির প্রতিকূল আচরণ করা উচিত নহে'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ৩১) ললিতাকে শান্ত করার জন্য সুবল শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তাকে পঞ্চবীটিকা দ্বারা আপ্যায়ন করেন। কিন্তু যখনই শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে অপমান করার পন্থা অবলম্বন করেছেন, তখনই ললিতা সুবলের আতিথেয়তা নস্যাৎ করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের কাপট্যপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে নানা কটূক্তি প্রয়োগ করতে ললিতা এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি, 'জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকা কামিনীময়ং। ইতি পরার্দ্ধং ইতি পৌরাণবচনস্যার্থঃ প্রত্যক্ষীকৃতঃ অর্থাৎ 'লুব্ধ ব্যক্তিগণ জগৎকে ধনময় এবং কামুক ব্যক্তিগণ জগৎকে কামিনীময় করিয়া দেখে, এই যে পৌরাণিক বচন, তাহার অর্থ অদ্য প্রত্যক্ষীকৃত হইল'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ৩৯) এভাবে ললিতা নানাভাবে রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং প্রিয়সখি রাধার মঙ্গলার্থে ললিতার এই চারিত্রিক দৃঢ়তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে আরো বলেছেন যে, ব্রজের গোপিনীবৃন্দ প্রত্যেকে চতুরশীতিলক্ষ মূল্যবতী কিন্তু প্রিয়সখি রাধা মহার্ঘ্য অর্থাৎ মূল্যের অতীত। তাকে কৌমারকাল পর্যন্ত কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি; তাই মহাসতী রাধার অঙ্গ স্পর্শের ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ যেন পরিত্যাগ করেন। এ কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে কঠোরভাষিণীরূপে সম্বোধন করেছেন। শুধু রাধার ক্ষেত্রে নয়, বৃন্দার ক্ষেত্রেও ললিতা কঠোর মনোভাব দেখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। তাই বিশাখা যখন বৃন্দাকে কৃষ্ণের হাতে অর্পণের কথা বলেছেন, তখন ললিতা বিশাখার প্রতি ক্রোধান্বিতা হয়েছেন। ললিতা বিশাখাকে আরো বলেছেন শ্রীদামকে আনয়ন করার জন্য। শ্রীদাম যেহেতু রাধার ভ্রাতা, তাই তিনিই পারবেন গোপিনীবর্গকে শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে রক্ষা করতে। ইত্যবসরে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা আদেশ দিলেন, শ্রীকৃষ্ণসহ গোপবর্গ সকলে যেন কানন কর প্রদান করেন। রাধার এই আদেশ পেয়ে ললিতা আজ্ঞা পালনে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি বিশাখাকে বলপূর্বক মধুমঙ্গলের মণিভূষণ কেড়ে নেওয়ার কথা বললেন। সুতরাং ললিতার এই সাহসিকতা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, যেহেতু রাধা শুল্কমূল্যে ক্রীতা হয়েছে, কাজেই সঙ্গমজনিত সেবাদ্বারা তাঁকে প্রীত করতে হবে। এই বলে যেই শ্রীকৃষ্ণ রাধার দিকে অগ্রসর হলেন অমনি ললিতা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন 'ললিতা দুর্ল্লালিত্যানাং তৎ কিমিতি আত্মানো মাহাত্ম্যং প্রেক্ষিয়িতুং প্রবৃত্তোহসি অর্থাৎ 'আমি দুর্ল্লালিত্ব ব্যক্তিদিগের ললিতা, অতএব কি আপনার মাহাত্ম্য দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছ'? (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ১০৪) এই চরম অপমানসূচক মন্তব্যেও শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত না হয়ে রাধার কাছে গমনের চেষ্টা করেন। এরপর বিশাখা বললেন যজ্ঞস্থলে ঘৃতের কলস বহন করার সময় কোনো কামুক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা চলবে না। ঠিক ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে স্পর্শ করলেন। ফলে রাধা ললিতাকে ধিক্কার জানালেন এবং ললিতাকে ওখান থেকে প্রস্থান করতে বললেন। তখন ললিতা প্রিয়সখি রাধার সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এই দুঃখে দুঃখিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ জানালেন, রাধাসহ সকল সাথকে তিনি যেন স্পর্শ করেন। তাহলে রাধা আর ললিতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না। কারণ ললিতা রাধাকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। শেষপর্যন্ত ললিতা যখন দেখলেন আর কোনোভাবেই যজ্ঞস্থলে যাওয়ার উপায় নেই, তখন শুল্কস্বরূপ রাধার কণ্ঠস্থ হার শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করে চলে যেতে চাইলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাতেও সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদেরকে মুক্তি দিলেন না। অতঃপর ললিতা পৌর্ণমাসীর শরণাপন্ন হলেন।

দানকেলিকৌমুদী ভাণিকায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ললিতা রাধার পঞ্চসখির মধ্যে প্রধান চরিত্ররূপে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চসখির মধ্যে ললিতাই একমাত্র রাধার কল্যাণার্থে শ্রীকৃষ্ণকে নানা কটূবাক্যে জর্জরিত করে পরাস্ত করেছেন এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেছেন। এখানে রূপগোস্বামী ললিতার চরিত্র অঙ্কনে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই অভিনব।

বৃন্দা

দানকেলিকৌমুদী ভাণিকার অন্যতম পার্শ্বনারী চরিত্র হলেন বৃন্দা। তিনি রাধার পঞ্চসখিদের মধ্যে একজন এবং শ্রীকৃষ্ণের দূতীরূপে এই ভাণিকায় উপস্থিত হয়েছেন। ভাণিকাটির শুরুতেই বৃন্দার মাধ্যমে জানা যায় সান্দীপনিমুনির মাতা পৌর্ণমাসীদেবীর উপদেশক্রমে নান্দীমুখী রাধা ঘৃত বিক্রয়ের জন্য যে যজ্ঞস্থলে যাচ্ছেন এই সংবাদ শ্রীকৃষ্ণকে অবগত করানোর জন্য গমন করছেন। সর্বোপরি ভাণিকাটির সূত্রপাত ঘটেছে বৃন্দা ও সুবলের কথোপকথনের মাধ্যমে। এদিক দিয়ে বৃন্দার চরিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুবল বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে রাধা কি শুধুমাত্র লঘু প্রয়োজনের জন্য যজ্ঞের প্রয়োজনীয় ঘৃত বিক্রয়ের জন্য সম্মত হয়েছেন, তখন বৃন্দা বলেছেন, 'মুনীগণ বলিয়াছেন, যে দিবস যাহাদের কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থ হবনযোগ্য মনোহারি হেয়ঙ্গবীন অর্থাৎ সদ্যোঘৃত স্বয়ং উপহারীকৃত হয়, সেই দিবসেই তাহাদের অভীষ্টার্থের সিদ্ধি হইয়া

থাকে, যজ্ঞের এই প্রক্রিয়া'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ :৭-৮) অর্থাৎ রাধা কুলবধূ হওয়া সত্ত্বেও কী কারণে মস্তকে ঘৃতের কলস স্থাপন করে ঘৃত বিক্রয়ের জন্য পথে বেরিয়েছেন, নাট্যকার রূপগোস্বামী সেই গুরুত্বপূর্ণ কারণটি বৃন্দার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মঙ্গল কামনায় গোবিন্দকুণ্ডে যজ্ঞ আয়োজনের প্রসঙ্গটিও নাট্যকার বৃন্দাকে দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকায় যজ্ঞানুষ্ঠানের মতো এক অভিনব বিষয়ের উদ্দেশ্য বৃন্দার মাধ্যমে ব্যক্ত করে নিঃসন্দেহে নাট্যকার রূপ গোস্বামী কৃষ্ণকথাসাহিত্যে অভিনবত্বের সঞ্চার করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা প্রেয়সী রাধার মাধুর্য অবর্ণনীয়। তাই ললিতা যখন অত্যধিক ভূষণ দ্বারা রাধাকে সজ্জিত করলেন তখন বৃন্দা রাগ করে বললেন, 'ত্রপতে বিলোক্য পদ্ম। ললিতে রাধাং বিনাপ্যলঙ্কারাং। তদলং মণিময়ম-নসণাভলরচনা প্রয়াসেন অর্থাৎ 'যখন অনলঙ্কৃতা রাধাকে সন্দর্শন করিয়া চন্দ্রাবলীর সখি পদ্মা লজ্জিতা হয়, তখন মণিময়ভূষণরচনা প্রয়াসের প্রয়োজন কী'? (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ১৯) বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা সম্পর্কে এমন চমৎকার মূল্যায়ন রাধাসখী বৃন্দার পক্ষেই করা সম্ভব। এই মূল্যায়নের মাধ্যমেই রাধা যে চন্দ্রাবলী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা এই কথাই বৃন্দা ব্যক্ত করেছেন। এরপর বৃন্দা বললেন যজ্ঞস্থলে ঘৃত বহন করে নিয়ে গেলে অভীষ্ট পূর্ণ হয়। বৃন্দার এ কথা শুনে রাধাসহ সখীবৃন্দ বৃন্দার এই আদেশ পালন করলেন। এক্ষেত্রে বৃন্দাকে অভিভাবিকার ভূমিকায় দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বারবার বৃন্দাকে রাধা-প্রসঙ্গে তাঁর প্রতি অনুকূল হতে বললেন। কিন্তু বৃন্দা ছিলেন অনড়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্ট করে জানালেন যে, 'নাগরেন্দ্র কৃতং নিরর্থকং দৃশস্তা-বেন যদিয়ং বৃন্দা বৃন্দাবনেশ্বরীমনুবর্ত্ততে অর্থাৎ নাগরেন্দ্র! চক্ষুর নৃত্য করান নিরর্থক হইল, যেহেতু এই বৃন্দা বৃন্দাবনেশ্বরীরই অনুবর্ত্তিনী'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ :৭১) একথা শোনার পর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দার প্রতি বেশি আর আগ্রহ দেখালেন না। বৃন্দা তখন চম্পকলতাকে গ্রহণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন। একথার প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মধুসূদনের উপযুক্ত প্রেয়সী একমাত্র রাধা। রাধা বিনে আর অন্য কোনো গতি নেই।

বৃন্দাবনরাজ্যে রাধার অভিষেক সম্পাদিত হয়েছিল বৃন্দার নির্দেশেই। আসলে শ্রীকৃষ্ণের আদেশেই বৃন্দা এটি করেছিলেন। রাজ্য অভিষেকের পর থেকেই রাধার বিশেষ অমাত্য পদে উদ্যানপালিনী বৃন্দা নিযুক্তা হলেন। এরপর বৃন্দা রাধাকে জানালেন যে, কানন কররূপ মূল্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসহ গোপবৃন্দ রাধা কর্তৃক ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছেন। তখন মধুমঙ্গল বললেন, বনের জন্য যে কানন কর সেই বন তো শ্রীকৃষ্ণেরই বন।

তখন বৃন্দা বললেন, রাধা এখন নতুন রাজ্ঞী। কাজেই পূর্বে ঐ বনের রাজা কে ছিলেন, তা বোধ করি আর কেউ মনে রাখবেন না। বৃন্দার এই চাতুর্যপূর্ণ সংলাপে শ্রীকৃষ্ণসহ গোপবর্গ পরাস্ত হলেন।

এই ভাণিকায় বৃন্দার চরিত্র স্বল্প পরিসরে চিত্রিত হলেও অন্যান্য সখির তুলনায় স্বতন্ত্র। প্রথাসিদ্ধভাবে রাধার সখিবৃন্দের ভূমিকা যেভাবে দেখা যায়, বৃন্দা প্রথার গণ্ডি অতিক্রম করে স্বমহিমায় এখানে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাই সখি হলেও বৃন্দার প্রতি রাধার একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা ছিল। তাই বৃন্দার সকল আদেশ নির্দেশ তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গে পালন করেছেন।

নান্দীমুখী

এই ভাণিকার অন্যতম প্রধান পার্শ্বনারী চরিত্র হলেন নান্দীমুখী। পৌর্ণমাসীর নির্দেশে নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন, 'শ্রীরাধা প্রভৃতি আমাদিগের বালিকা, তাহারা আজি হৈয়ঙ্গবীন গ্রহণ করিয়া যজ্ঞে গমন করিবে, অতএব তাহাদের ঘট্টদানে তুমি কল্যাণশালী হইয়া অনুকূল ভাব প্রকাশ করিবে'।(রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ৪৭) এখানে স্পষ্টতই বোঝা গেল নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করে বিবাদের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। আবার অন্যদিকে নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুকূল ভাব প্রকাশ করতে রাধাকে অনুরোধ করছেন। আসলে নান্দীমুখীর অভিপ্রায় হচ্ছে দানলীলার মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধন।

শ্রীকৃষ্ণের হাতে বৃন্দাকে যখন সমর্পণের কথা উত্থাপিত হয়েছে, তখন নান্দীমুখী বলেছেন, 'কীর্ত্তিদাকীর্ত্তিদায়িনি রাধে অযুক্তং খল্বিদং যৎ বনমালিন এব বৃন্দায়া অস্মৈ শুল্কার্পণং অর্থাৎ কীর্তিদাকীর্ত্তিদায়িনি রাধে! এটা অতিশয় অযুক্ত, যেহেতু বনমালির বৃন্দাকে বনমালির সম্বন্ধে শুল্কার্পণ'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ৭০) এখানেও নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করে কথা বলেছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধাকে প্রবল প্রতাপের দ্বারা পীড়ন করবেন বলেছেন, তখন নান্দীমুখী শাসনের সুরে বলেছেন কুলবালা পীড়ন অতি অযোগ্য। সুতরাং এখানে নান্দীমুখীকে বয়োজ্যেষ্ঠা অভিভাবকের ন্যায় আচরণ করতে দেখা যায়।

বৃন্দাবনেশ্বরী রাধার রাজ্যাভিষেক ছিল এই ভাণিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নান্দীমুখী বলেছেন যে, বৃন্দার ইচ্ছাতেই ভগবতী পৌর্ণমাসী বৃন্দাবনরাজ্যে রাধার অভিষেক সম্পাদন করেছেন। আসলে এটি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সম্পাদিত হয়েছে। আবার নান্দীমুখী রাধার শ্রেষ্ঠত্বের মহিমাকে তুলে ধরতেই রাজ্যাভিষেকের ঘটনা সকলকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এটিই ছিল নাট্যকার রূপগোস্বামীর প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়েছে অন্যতম প্রধান নারীচরিত্র নান্দীমুখীর মাধ্যমে। এদিক দিয়ে নান্দীমুখীর চরিত্রটি গুরুত্বের দাবি রাখে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধাকে সেবা করতে চেয়েছেন তখন ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করলে নান্দীমুখী ব্রজের যুবরাজের সম্মান রক্ষার্থে এই অপমানের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তখন ললিতা নান্দীমুখীকে চলে যেতে বললে, নান্দীমুখী স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলেছেন, 'এই মহাসংকটে তিনি গোপিনীবৃন্দকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারেন না। কারণ যেহেতু ধর্ম্ম অপেক্ষা স্নেহের বল অধিক'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ১০৭) এখানেও নান্দীমুখী স্নেহপরায়ণ অভিভাবকের ন্যায় আচরণ করেছেন। নান্দীমুখী রাধাকৃষ্ণের মিলন চাইলেও দানঘাটে শ্রীকৃষ্ণের অন্যায় বিবাদকে তিনি সমর্থন তো করেননি বরং গোপিনীবর্গকে শ্রীকৃষ্ণের অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে নিজের স্নেহের বাহুডোরে জড়িয়ে রেখেছেন। দানঘাটে রাধাকৃষ্ণের বিবাদ হতে হতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হয়েছে। তখন নান্দীমুখী ললিতাকে জিজ্ঞাসা করছেন, তোমরা কত শুল্ক দিতে সম্মত? একথার কোনো উত্তর না পেয়েই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, 'মহাদানীন্দ্র আত্মনোহভিমতং দানং দৃঢ়ং কথ্যতাং যথা মধ্যস্থী ভূয় ময়া পরিচ্ছিদ্যতে অর্থাৎ দানীন্দ্র! স্বীয় অভিমত দান কি, প্রকাশ করিয়া বল, আমি মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দিতেছি'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ১২০) এই কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে শুল্কস্বরূপ প্রদান করতে অনুরোধ করেন। তখন নান্দীমুখী চিত্রাকে শুল্করূপে গ্রহণ করতে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে পৌর্ণমাসী এসে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘ কলহের ভারে কুপিত, ক্লান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি প্রদানের ভার কে বহন করতে পারবে– নান্দীমুখীর এই প্রশ্নের উত্তরে পৌর্ণমাসী 'রাধার' নাম উচ্চারণ করলেন। এ পর্যন্তই নান্দীমুখীর উপস্থিতি এ ভাণিকায় লক্ষ্য করা যায়।

নান্দীমুখী একজন স্নেহশীলা বয়োজ্যেষ্ঠা নারী হিসেবে এই ভাণিকায় চিত্রিত হয়েছে। পৌর্ণমাসীর দেওয়া দায়িত্ব তিনি যথাযোগ্যভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি একবার শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করেছেন আবার রাধাসহ গোপিনীবৃন্দের পক্ষ নিয়েছেন। সুতরাং এদিক দিয়ে নান্দীমুখীর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই প্রশংসনীয়।

সুবল

ভাণিকার অন্যতম পার্শ্ব পুরুষচরিত্র হলেন শ্রীকৃষ্ণ সখা সুবল। শুরুতেই বৃন্দার সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে সুবলের প্রবেশাধিকার ঘটে। বৃন্দার কাছ থেকে সুবল যখন জানতে পারলেন ঘৃত বিক্রয়ের ছলে দানঘাটে রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হবে তখন তিনি আনন্দিত বোধ করলেন। বৃন্দার সঙ্গে সুবলের আলাপচারিতার মাধ্যমে নাট্যকার যজ্ঞাদি বিষয়ে অর্থাৎ যজ্ঞের ঘৃত বিক্রয়ের জন্যে পথিমধ্যে কৃষ্ণ ও রাধার দানশুল্ক নিয়ে বিবাদের প্রসঙ্গ বৃন্দা ও সুবলের কথোপকথনের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। এখানেই সুবল চরিত্রের গুরুত্ব।

এরপর বৃন্দার নির্দেশে সুবল গোবর্ধন পর্বতোপরি শ্যামলমণ্ডপের পৃষ্ঠভাগে শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থিত করলেন। রাধাসহ গোপিনীবর্গ সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও সুবলকে অবজ্ঞা করলেন। তখন সুবল বলছেন, 'তোমরা অগ্রে ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া মহাঘট্টদানীন্দ্রকে প্রণাম কর'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ২৮) স্পষ্টতই বোঝা গেল সুবল এখানে কৃষ্ণের সখারূপে ও অমাত্যরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। আবার ললিতা যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরূপ আচরণ করেছেন তখন সুবলই যোগ্য উত্তর দিয়েছেন। রাধাপ্রাপ্তিতে চরম প্রতিবন্ধকরূপে ললিতা যখন রুখে দাঁড়িয়েছেন তখন শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলেছেন অলীক বা গ্বিলাস দ্বারা ললিতাকে পরাস্ত করতে। মোটকথা, শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে নির্ভর করতেন। সেই নির্ভরতারবশেই গোপিনীদের সঙ্গে বাকযুদ্ধে বিব্রত শ্রীকৃষ্ণ সুবলের শরণাপন্ন হয়েছেন, সুবলের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। সুবল যখন ছলপূর্বক গোপিনীবৃন্দের কলস ঘট্টগৃহে রেখে আসবেন বলেছেন, তখন ললিতা চৌরচক্রবর্তীর লীলাবিশেষ অমাত্যরূপে সুবলকে ধিক্কার করেছেন। এরপর সুবল ভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলেন পঞ্চকলস বহনের জন্য। এতে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলেন যে, ললিতার ভয়ে সুবল দুর্বল হয়ে গেছেন। একথা শুনে সুবল বলেছেন :

> কেবল বচনমাত্রেই সুলভ এমত দর্পরাশির প্রয়োজন নাই, তোমার বিক্রম ভালরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, কেননা সেদিন শ্রীরাধার সহিত পাশাক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে ললিতা ছলপূর্ব্বক শ্রীরাধার জয় ঘোষণা করিয়া তোমার মুরলী কাড়িয়া লইয়াছিল, পরে তুমি কৌস্তুভমণি গোপন করিলে স্মেরাননা গোপযোষা সকল তোমার প্রতি কটাক্ষ করিলে তুমি সহসা শঙ্কাকুল হইয়াছিলে। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ৮২)

এখানে সুবল শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব সম্বন্ধে চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন আসলে সুবল শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। উপরন্তু রাধা-কৃষ্ণের পাশাখেলার মতো অভিনব বিষয়টিও সুবলের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন। এতে সুবল চরিত্রের মহত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর বিশাখা সুবলকে কানন কর প্রদানের কথা বললে, সুবল তাকে এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের কথা বললেন, 'যঃ খলু মহামন্মথচক্রবর্ত্তী স এব নিশ্চিতং প্রিয়বয়স্যরূপেণ বর্ত্তমানো জ্ঞায়তাং দ্বয়োঃ কিল পরমার্থতো ভিন্নতা নাস্তি অর্থাৎ যিনি মহামন্মথ চক্রবর্ত্তী তিনিই নিশ্চয় প্রিয়বয়স্যরূপে বর্ত্তমান আছেন জানিও, স্বরূপতঃ এই দুইয়ের ভিন্নতা নাই অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ দুই একই পদার্থ'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ১০০) রাধাকৃষ্ণ স্বরূপত এক কিন্তু লীলাবিলাসের জন্যে ভেদরূপে অবতীর্ণ হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এই তত্ত্বটি নাট্যকার সুবলের মুখে ব্যক্ত করেছেন। এরপর সুবলের উপস্থিতি আর ভাণিকায় দেখা যায় না

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সখা হিসেবে সুবল তাঁর দায়িত্ব যথাযোগ্যভাবে পালন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে যখন রাধাসহ সখিবৃন্দ অপমান করেছেন, তখন তিনি অপমানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাঁর প্রিয়সখা তেমনি ব্রজের যুবরাজ। তাই যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের সম্মান রক্ষার্থে তিনি সর্বদা সক্রিয় ছিলেন। এদিক দিয়ে সুবল চরিত্রটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

মধুমঙ্গল

মধুমঙ্গল এই ভাণিকায় বিদূষক শ্রেণির[৮] সহায়ক হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান সখা। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয় সাধনে সহায়তা করেছেন, তাঁদের আনন্দ দিয়েছেন এবং তাঁদের মিলন সংঘটনে সর্বদাই সাহায্য করেছেন। তিনি গোবর্ধন পর্বত সমীপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে গোপিনীবৃন্দের সঙ্গে দানশুল্কজনিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি হয়ে মধুমঙ্গল সখিদের বলেছেন :

> তোমরা যখন সঙ্গব অর্থাৎ প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত সময়ে আগমন করিয়াছ, তখন তোমাদিগের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করা উপযুক্ত নহে, কিন্তু হৈয়ঙ্গবীনভার বহন করিতে করিতে তোমাদের মধ্যদেশ বক্র হইয়াছে, একারণ ঘটে আগমনপূর্ব্বক আপনাদিগের স্নিগ্ধতা সম্পাদন কর এবং অবজ্ঞাজনিত দোষ নিবারণার্থ সম্মতিপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া যথাসুখে প্রস্থান কর। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ৩১)

এখানে মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত প্রতিনিধি হয়ে শান্ত স্নিগ্ধস্বরে ন্যায্য শুল্ক আদায় করতে চেয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন, শুল্ক আদায়ের শুরুতেই রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করলে সুষ্ঠুভাবে শুল্ক আদায় করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি কৌশল অবলম্বন করে শুল্ক আদায়ের চেষ্টা করেছেন। এখানেই তার বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

মধুমঙ্গল যখন দেখলেন গোপিনীবর্গ কিছুতেই শুল্ক প্রদান করবেন না তখন তিনি অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে রাধাসহ সখিবর্গের কাছে গিয়ে বললেন, আমি কুলীন ব্রাহ্মণ, আমার উদর পূরণের জন্য কিছু ঘৃত আপনারা প্রদান করুন। এখানে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মধুমঙ্গল শুল্ক প্রার্থনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য অমাত্যরূপে দানঘাটের রক্ষক হয়ে তিনি গোপিনীদের সঙ্গে দানের শুল্ক সম্পর্কে নিখুঁত দরকষাকষি করেছেন। এখানে দানের শুল্ক সম্পর্কে মধুমঙ্গলের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর নান্দীমুখীর কথামতো মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বললেন যে, রাধাসহ সখিবৃন্দ যদি উপযুক্ত শুল্ক প্রদান করতে না পারেন তবে চতুরশীতিলক্ষ শুল্কের পরিবর্তে গোপিনীবৃন্দ নিজেদেরকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এখানে মধুমঙ্গল নান্দীমুখীর নাম করে অভিনব দান-প্রদানের পথ নির্দেশ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে মধুমঙ্গলের চতুরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এতকিছুর পরেও গোপিনীবর্গ যখন শুল্ক প্রদান করলেন না, উপরন্তু রাধার আদেশে শ্রীকৃষ্ণসহ সখাবর্গকে কানন কর প্রদানের জন্য নির্দেশ দিলেন তখন মধুমঙ্গল তার স্বভাব সুলভ চরিত্র পরিবর্তন করে ক্রোধমূর্তি ধারণ করে বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের দয়ার কারণেই গোপিনীবর্গ বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে পেরেছেন, সুতরাং গোপিনীবৃন্দকে কানন কর প্রদান মোটেই সঙ্গত নয়। তাই মধুমঙ্গল বৃন্দাকে বলেছেন, 'মুঞ্চথ বাচালত্বং অস্মৎপ্রিয়বয়স্যস্যৈব কান্তারাধীশতা শ্লেষেণ কান্তারাধী-শতেতি। অতঃ করহারীভির্যুস্মাভিঃ রাজকুলপুরুষা বয়ং খণ্ডকুণ্ডলিকাভিঃ সংমন্যামহে অর্থাৎ বাচালতা পরিত্যাগ কর, আমাদের প্রিয়বয়স্যই এই কান্তারের অধীশ্বর, অতএব আমরা রাজকুলপুরুষ, করপ্রদায়িনী তোমাদিগকে খণ্ডকুণ্ডিকা অর্থাৎ গূড়বিকৃতি জীলাবীর ন্যায় বোধ করি'। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন [অনূদিত] ও বিজন গোস্বামী [সম্পাদিত], ১৯৯৮ : ১০১) এখানে মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করায় গোপিনীবৃন্দের সঙ্গে তাঁর বিবাদ চরমে পৌঁছেছে। শ্রীকৃষ্ণভক্ত হওয়ার সুবাদে মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন, ঠিক সেইভাবে রাধার মাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠত্বকে সহজে গ্রহণ করতে পারেননি। রূপগোস্বামী এই দুই বিপরীত বিষয় মধুমঙ্গলের মধ্যে সুন্দররূপে রক্ষিত করেছেন।

রূপগোস্বামী একাঙ্ক নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিদূষক তথা শ্রীকৃষ্ণের সখার ভূমিকায় মধুমঙ্গলকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। এছাড়া দানপ্রথার সঙ্গে সম্পর্কিত শুল্কের হিসাব সম্পর্কে মধুমঙ্গলের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে একই সঙ্গে পরিহাসমুখর কমিক চরিত্ররূপেও তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন।

এবার ভাণিকাটির রস নিয়ে আলোচনা করা যাক।

রস সাহিত্যের প্রাণ। এই রসকে নিয়ে যুগ যুগ ধরে আংলকারিকগণ দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। আচার্য ভরত (খ্রিষ্টীয় ৩য় শতক) থেকে শুরু করে পণ্ডিত জগন্নাথ (খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতক) পর্যন্ত একটি ধারাক্রম লক্ষিত হয়। আচার্য ভরত *নাট্যশাস্ত্রে* রসকে আটপ্রকার বলে অভিহিত করেছেন : শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, ও অদ্ভুত। পরবর্তীকালে পণ্ডিত জগন্নাথ শান্তরসকে স্বীকার করে রসকে নয় প্রকার বলেছেন। বৈষ্ণবগণ এই আটপ্রকার বা নয় প্রকার রসকে ভিন্ন অভিধায় প্রকাশ করেছেন। যেমন– শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার বা মধুর। এই রসগুলোর মূলে রয়েছে ভক্তি। বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রসময়, 'রসো বৈ সঃ'। রস অনুভববেদ্য, ব্যাখ্যেয় নয়। তাই রস উপলব্ধির জন্য পরমপুরুষের চিন্তার মধ্যেই দ্বৈতসত্তা রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন ভক্তিবাদী বৈষ্ণবগণ। *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকার পটভূমি বিচার করলে একে 'মধুরভক্তিরস'[৯] প্রধান নাটক বলা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, রূপগোস্বামী বিরচিত *দানকেলিকৌমুদী* নামক সংস্কৃত ভাণিকায় নাট্যতত্ত্বে ভাণিকার যে লক্ষণসমূহ বর্ণিত হয়েছে তা যথাযথরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

সমগ্র নাটকটি একটি দিবসের মধ্যে গোবর্ধন পর্বত সমীপে অভিনীত হয়েছে। এখানে স্থানগত ও কালগত ঐক্যও রক্ষিত হয়েছে। সর্বোপরি ঘটনাগত ঐক্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দানলীলাকে কেন্দ্র করে ঘটনার উত্থান, বিকাশ ও পরিণতি লক্ষিত হয়েছে। নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। কোন চরিত্রের সংলাপ দীর্ঘ হয়নি, আবার একেবারে সংক্ষিপ্তও হয়নি। একাঙ্ক রূপকের স্বল্প পরিসরে প্রধান চরিত্রগুলি অর্থাৎ রাধা, কৃষ্ণ, ললিতা ও বিশাখা চিত্রিত হয়ে নাট্যকারের উদ্দেশ্যকে অর্থাৎ দানলীলার আধারে বৃন্দাবনলীলার মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। অন্যদিকে পার্শ্ব নারী ও পুরুষচরিত্রগুলো স্বল্প পরিসরে চিত্রিত হয়ে স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। সর্বোপরি বিভিন্ন ধরনের চরিত্র অর্থাৎ ব্রজের যুবরাজ কৃষ্ণ, ব্রজেশ্বরী গৃহবধূ রাধা, রাধার পঞ্চ সখি, পৌর্ণমাসী, কৃষ্ণসখা সুবল ও অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণের বিদূষক মধুমঙ্গল, নান্দীমুখী প্রমুখ চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন এই একাঙ্ক রূপকল্পে। এই বৈচিত্র্যমুখী চরিত্র-চিত্রণ রূপগোস্বামীর পক্ষেই সম্ভব। এছাড়া আছেন সূত্রধার ও নট, এঁরা শুধু ভাণিকাটির সূত্রপাত ঘটিয়েছেন, কোন ভূমিকায় তাদের দেখা যায়নি। 'কুন্দলতা' নামে রাধার আরেক সখির নাম ও 'বিজয়' নামে এক শ্রীকৃষ্ণ সখার নাম পরোক্ষভাবে জানা যায়। এদের কোনো সরাসরি উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি। সুতরাং রূপগোস্বামী *দানকেলিকৌমুদী* ভাণিকায় বিষয়বস্তু, চরিত্র-চিত্রণ, রাধা-কৃষ্ণের অভিনব মধুরলীলারস অঙ্কনে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা সত্যিই নবরূপে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. 'দবির খাস' ফার্সি শব্দ। এর শুদ্ধরূপ হলো দবির-ই-খাস। খাস মানে নিজস্ব এবং দবির মানে লেখক বা মুন্সি। সুতরাং দবির খাস শব্দের অর্থ হলো নিজস্ব কর্মসচিব বা প্রাইভেট সেক্রেটারি।

২. ভাণিকা শ্লক্ষ্ণেপথ্যা মুখনির্বহণান্বিতা।
কৈশিকী-ভারতীবৃত্তিযুক্তৈকাঙ্কবিনির্মিতা॥
উদাত্তনায়িকা-মন্দানায়কাত্রাঙ্গসপ্তকম্
উপন্যাসোহথ বিন্যাসো বিরোধঃ সাধবসং তথা॥
সমর্পণং নিবৃত্তিশ্চ সংহার ইতি সপ্তমঃ।

অর্থাৎ ভাণিকা উপরূপকে বেশভূষা মনোহর হয়; একটি মাত্র অঙ্ক থাকে এতে মুখ ও নির্বহণ সন্ধি এবং কৈশিকী ও ভারতী বৃত্তি থাকে। এর নায়িকা হয় উত্তমশ্রেণির এবং নায়ক হয় নীচশ্রেণির ব্যক্তি। এতে সাতটি অঙ্গ থাকে। যথা– উপন্যাস, বিন্যাস, বিরোধ, সাধবস, সমর্পণ, নিবৃত্তি ও সংহার। (বিশ্বনাথ, ১৩৮৬ : ৪৭৩)

৩. শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়েই বসুদেবের পুত্র কিন্তু কংসের হাত থেকে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করার জন্য দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর তাঁকে নন্দালয়ে যশোদার কাছে রেখে

আসেন এবং যশোদার গর্ভজাত কন্যাকে (মহামায়া) এনে কংসের হাতে দেন সেই থেকে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ ও যশোদার পুত্ররূপেই বেড়ে উঠতে থাকেন। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের শান্তির জন্য যজ্ঞ করছেন, তাও নিজেকে গোপন রেখে। তিনি গর্গমুনির জামাতা ভাগুরিকে দিয়ে এ যজ্ঞ করাচ্ছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পুত্র না বলে মিত্রপুত্র অর্থাৎ নন্দের পুত্র বলে পরিচয় দিচ্ছেন, যাতে করে শ্রীকৃষ্ণ যে বসুদেব-দেবকীর অষ্টম পুত্র, তা কংস যেন জানতে না পারে, যাতে শ্রীকৃষ্ণের কোনো ক্ষতি কংস না করতে পারে।

৪. নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো ব্যায়োগ এব চ।

ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিমঃ ॥

ঈহামৃগশ্চ বিজ্ঞেয়ো দশমো নাট্যলক্ষণে

এতেষাং লক্ষণমহং ব্যাখ্যাস্যাম্যনুপূর্বশঃ ॥ (ভরত, ১৯৮২ : ১৯)

৫. নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী, সট্টকং নাট্যরাসকম্

প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খনং রাসকং তথা ॥

সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পিকং চ বিলাসিকা।

দুর্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ ॥ (বিশ্বনাথ, ১৩৮৬ : ৩৩১)

৬. বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ। নিশ্চিতো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশ ইতি ধীর ললিতলক্ষণং। অত্রাপনীতেতি নিশ্চিন্তত্বং। বিহরন্নিতি পরস্মৈপদ প্রয়োগেণ প্রেয়স্যানন্দ দান তাৎপর্য্যবগমাৎ প্রেয়সীবশত্বং। অর্থাৎ বিদগ্ধ, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা, রসিকতা ও নিশ্চিন্ততা প্রভৃতি গুণ সকল যাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাঁকে ধীরললিত নায়ক বলা হয়। তিনি প্রায় প্রেয়সীর বশীভূত হয়ে থাকেন এবং সেই প্রেয়সীতেই তাঁর অনুকূলতা। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, ১৩৪১ : ৩৭)

৭. যে সব নায়িকা ইহকাল-পরকালের ভয় না রেখে গভীর অনুরাগে দয়িতের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, ধর্মমতে বা সামাজিক অধিকারে পত্নীরূপে স্বীকৃতা না হলেও, প্রেমের অধিকারে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিতা। নায়িকা হিসাবে তাঁরাই পরকীয়া। (হীরেন্দ্রনারায়ণ, ১৩৭২ : ২৪)

৮. কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।

হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্মজ্ঞঃ ॥

পুষ্প-বসন্ত প্রভৃতি নামবিশিষ্ট, ভোজনে অতি লোলুপ, কর্ম, দেহভঙ্গি, বেশভূষা, বাক্যব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা হাস্যোৎপাদনকারী এবং বিবাদ-প্রিয় সহায়ককে বিদূষক বলে। (বিশ্বনাথ, ১৩৮৬ : ১২৩)

৯. আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি।

মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোহসৌ মধুরা রতিঃ ॥

অর্থাৎ ভক্তহৃদয়ের মধুররতি, বিভাব প্রভৃতির সহযোগিতায় পুষ্টি লাভ করলেই মধুরভক্তিরস হয়। এই রসের আলম্বন বিভাব নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও প্রিয়া রাধা ও

অন্যান্য গোপীগণ এবং এর উদ্দীপন বিভাব হলো বেণুগীতি, কদম্বকুঞ্জ ইত্যাদি। এই মধুর রস সকল রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই মধুরভক্তিরস বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে দ্বিবিধ (হরিদাস দাস, ১৩৬৫ : পশ্চিম বিভাগ, ১০৯)

গ্রন্থপঞ্জি

১. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) (১৯৯৭) *চৈতন্যচরিতামৃত*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, একাদশ সংস্করণ, কলকাতা

২. নরেশচন্দ্র জানা (১৯৭০) : *বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী*, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, কলকাতা

৩. বিশ্বনাথ কবিরাজ (১৩৮৬) : বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *সাহিত্য দর্পণ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২য় সংস্করণ, কলকাতা

৪. রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক (অনূদিত) ও বিজন গোস্বামী কর্তৃক (সম্পা.) (১৯৯৮) : *দানকেলিকৌমুদী*, মহেশ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা

৫. রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক (অনূদিত) (১৩৪১) *উজ্জ্বলনীলমণি*, মুর্শিদাবাদ, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা

৬. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) (১৯৮২) : *ভরত নাট্যশাস্ত্র* (৩য় খণ্ড), ১ম প্রকাশ, কলকাতা।

৭. হরিদাস দাস (সম্পা.) (১৩৬৫) *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, নবদ্বীপ, কলকাতা।

৮. হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) (১৩৭২) : *উজ্জ্বলনীলমণি*, ভারতী প্রকাশন, কলকাতা